**শবে মিরাজ**

মিরাজ শব্দটি উরুজ ধাতু হতে উদ্ভব। এর শাব্দিক অর্থ  উর্ধ গমণ, সিড়ি, আরোহণ। মিরাজ     সম্পর্কে ২টি মতবাদ প্রচলিত আছে। কিছু ব্যক্তির মতে ঘটনাটি ঘটে  স্বপ্নযোগে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ও গবেষকদের মতে মিরাজ শারিরীক ভাবেই ঘটেছিল। মিরাজ সম্পর্কিত উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সাঃ)কে ‘’আবদ’’বলে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য রক্ত মাংসের দেহ ও আত্নার সমন্বয়ে ‘’আবদ’’ (বান্দা) হয়। মহা নবীর (সাঃ) মিরাজকে যদি আধ্যাত্নিক বলে ধরে নেয়া হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক “আবদ’’ শব্দটা অর্থহীন হয়ে যায়। তাছাড়া আবদিহী শব্দটি আরবী ব্যকরণে সমর্থক ক্রিয়া অর্থাৎ তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এটি শারিরীক ভ্রমণের আরো একটি প্রমান। মিরাজ একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অলৌকিক ঘটনা ।এই ঘটনাকে নিয়ে অতীতেও বহু বাকবিতন্ডা হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। কিন্ত যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য।সত্যকে কোনো দিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। এ সম্মন্ধে পবিত্র কোরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে;-   “ছুবাহানাল্লাযী আছরা আবদিহী লায়লাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকছাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিইয়াহু মিন আয়াতিনা’’ অর্থাৎ পবিত্র ওমহিমাময় তিঁনি , যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাত্রিতে মাসজিদিল হারাম (কাবা শরীফ) হতে মাসজিদিল আকছা  ( বায়তুল মুকাদ্দস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন,যার চতূর্পার্শকে বরকতময় করা হয়েছে, উদ্যেশ্য  আল্লাহর কোদরতের কিছু বিস্ময়কর নিদর্শন  দেখিয়ে দেওয়া । এ সম্মন্ধে পবিত্র কোরআন মাজিদে আরো বলা হয়েছে;-এবং তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিলেন, তার পর আল্লাহর নিকটবর্তী হলেন,এতটা নিকটবর্তী যে, দুই ধনুকের জ্যা অথবা তার চেয়েও কাছে।অতঃপর আল্লাহ  তাঁর বান্দার প্রতি যা কিছু প্রকাশ করার ছিল, তা প্রকাশ করলেন(‘’ফা আওহা ইলা আবদিহী মা আওহা’’) এখানে এই ভ্রমনের উদ্দেশ্য সম্মন্ধে বলা হয়েছে,আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন সমুহের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেওয়া। এই বিস্ময়কর নিদর্শন মধ্যে বায়তুল মোকাদ্দসও একটি বটে। কিন্তু প্রধান প্রধান নিদর্শন রয়েছে আকাশ মন্ডলে এবং  তিনি বায়তুল মোকাদ্দস পর্যন্ত যেয়েই ক্ষান্ত হন নাই বরং সপ্ত আকাশও ভ্রমন করেছেন এবং তার প্রমান মিলে উপুরোক্ত আয়াত থেকে।

শবে মিরাজের সক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ- হযরত  মুহাম্মদ (সাঃ) ৫০ বৎসর বয়সে তাঁর নবুয়াতের দশম বৎসরে রজব মাসের ২৭ তারিখে এই বিস্ময়কর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়েছিল। নবীজি সরাসরি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করলেন। আশেক ও মাশোকের মধ্যে নানা বিধ কথোপকথন হলো।আল্লাহ তায়ালা তাঁকে  সৃষ্টির সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে দিলেন এবং বেহেশত দোযখ দেখিয়ে দিলেন, যাতে এ সমন্ধে কথা বলতে তাঁর মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। সর্ব শেষ তিনি

আল্লাহর নিকট হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ লয়ে আবার বুরাকে আরোহণ করে মুহুর্তের মধ্যে পৃথিবীর মাঝে ফিরে এলেন। সংক্ষেপে এই টুকু হলো মিরাজের ঘটনা। কিন্ত ঘটনাটি এতই অলৌকিক, এতই অস্বাভাবিক যে, সাধারন মানুষের এটা বুঝে আসেনা, জ্ঞানে ধরেনা ।কিন্ত তা স্বত্বেও ঘটনা ঘটেছে এবং এরুপ ঘটনার আরো অনেক প্রমান কোরআন হাদিছে রয়েছে, যেমনঃ-হযরত মুসা (আঃ)দলবল সহ হেটে নীলনদ পার হওয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের বিশাল অগ্নীকান্ড হতে রক্ষা পাওয়া, হযরত ইউনূস (আঃ)কে মাছের পেট হতে রক্ষা পাওয়া, হযরত ঈসা (আঃ) এর আকাশে আরোহন এবং আবারো দুনিয়ায় আগমন হবে, বিবি মরিয়মের স্বামী ব্যতীত পুত্র সন্তান লাভ, এবং হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর মিরাজ ভ্রমন ও কাফেরদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা ইত্যাদি।

মিরাজ কি স্বপ্ন ছিল ? কেউ কেউ মিরাজ কে স্বপ্ন বলে অভিহীত করেছেন। কিন্ত এটা স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্ন হলে নবীজি সোজা সোজি বলে দিতেন, যে, গত রাত্রে আমি এ ধরনের একটা স্বপ্ন দেখেছি, সে ক্ষেত্রে এই সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর যাবত এ নিয়ে এত তর্ক বিতর্কের  প্রয়োজন হত না, কেননা স্বপ্নে মানুষ বহু কিছু দেখতে পাড়ে। আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎসৃষ্টি রহস্য ও বেহশত ও দোযখ সামনা সামনি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য প্রিয় হাবীবকে তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর হাবীব প্রবল আত্ন বিশ্বাস নিয়ে ইসলাম প্রচার করতে পারেন। কাজেই এটা স্বপ্ন ছিল না, আল্লাহরইচ্ছায় বাস্তবেই এটা সংঘটিত হয়েছিল। মানুষযদি একটু চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে অতি সহজেই বোঝতে পারবে যে, মূহুর্তের মধ্যে কি করে এত বড় একটা দীর্ঘ ভ্রমন সম্ভব হতে পারে ?। ব্যপারটা বুঝতে হলে সময় ও আলোর গতি সমন্ধে সম্মক জ্ঞান থাকতেহবে। সময় সব জায়গায় এক নয় এবং একই গতিতে সব জায়গায় বয়ে যায় না। স্থানের অবস্থান অনুসারে সময়ের পরিবর্তন হয়। চট্রগ্রামও দিনাজপুরের সময় এক নয়, অনূরুপ ভাবে কলকাতা ও দিল্লীর সময় এক নয়।যদিও বিশ্বের জন্য একটা ষ্টান্ডার্ট টাইম ঠিক করা আছে। কিন্ত বিভিন্ন দেশে এই ষ্টান্ডার্ড টাইম বিভিন্ন । যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতে ষ্টান্ডার্ট টাইমের পার্থক্য আধা ঘন্টা, সৌদি আরবেরসঙ্গে ৩ ঘন্টা, লন্ডনের সঙ্গে ৬ ঘন্টা, আরআমেরিকারসঙ্গে ১২ ঘন্টা।এই যে, সময়ের পার্থক্য এটাএই পৃথিবীর ঘড়িতে এবং স্থানের বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে। কিন্ত এই পৃথিবীর ঘড়ির কোন মিল নেই। আবার চাঁদের ঘড়ির সাথে সূর্যের ঘড়ির কোন মিল নেই। অনূরুপ ভাবে প্রত্যেক গ্রহ ও উপগ্রহের ঘড়ি আলাদা আলাদা ।

এবার আলোর গতিকে যদি বিবেচনায় আনি, তবে সময়ের আকাশ পাতাল ব্যবধান এসে যাবে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। যতক্ষন আপনি গতির চেয়ে কম গতিতে ভ্রমন করবেন, ততক্ষন সময় নিয়ম মাফিক বয়ে চলবে, অর্থাৎ সকালের পর দুপুর, দুপুরের পর বিকাল এবং বিকালের পর রাত্রি আসবে।কিন্ত আপনি যদি আলোর গতিতে ভ্রমন করেন, তবে সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে অর্থাৎ সকালে রওয়ানা হলে সকালই থেকে যাবে । বিকালে রওয়ানা দিলে বিকালই থেকে যাবে। সময়ের কোন পরিবর্তন হবে না। আরো আশ্চার্যের ব্যাপার এই যে, আপনি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশী গতিতে ভ্রমন করতে পারেন তবে সময় উল্টা দিকে বয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যদি বিকালে রওয়ানা হন তবে অনেক্ষন চলার পর ঐ দিনের সকাল পাবেন।তবে সময় উল্টা দিকে বয়ে যাবে, অর্থাৎ আপনি যদি বিকালে রওয়ানা হন তবে অনেক্ষন চলার পর ঐ দিনের সকাল পাবেন, তারপর আগেরদিনের রাত্রি পাবেন।তারপর আগের দিন পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ রবিবার রওয়ানা হয়ে আপনি একদিন পর শনিবার পেয়ে যাবেন।সেখানে নিয়ম মাফিক সোমবার পাওয়ার কথা। আর এই ভাবে চলতে চলতে আপনি কোন সময় এমন পর্যায়ে পৌছে যাবেন যে, পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সংঘটিত হয়েছিল সেটিকে আপনি সদ্য সঙ্ঘটিত হচ্ছে এমনটি দেখতে পাবেন।

এবার মিরাজ শরীফের ঘটনায় ফিরে যাই,যে বাহনে করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই ভ্রমন সম্পন্ন করেন , হাদিস শরীফ অনুযায়ী সেই বাহনের নাম বোরাক। বোরাক আরবী ‘বারকুন’ শব্দ হতে উদ্ভূদ্ধ। এর অর্থ হলো বিদ্যুৎ , এই বোরাকের গতিবেগ ছিল আলোর গতিবেগ অপেক্ষা অনেক বেশী। কেননা বর্ণনায় এরুপ আছে যে, প্রতি মূহুর্তে তিঁনি এক আসমান পাড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ধরায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পান যে, তাঁর অজুর পানি এখনও গড়িয়ে যাচ্ছে। তাহলে ধরা যাক আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। ১ মিনিটে  ১,৮৬০০০\*৬০=মাইল,১ঘন্টায় ১,৮৬০০০\*৬০\*৬০= মাইল,২৪ ঘন্টায় ১,৮৬০০০\*৬০\*৬০\*২৪\*৩৬৫= মাইল। তাহলে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র ধরেনিয়ে ১ (এক) সেকেন্ডে যদি বোরাকের এক পাল হয় ( এক পাল সমান ৪৭ মাইল) তবে এর গতিবেগ দাঁড়ায় ১,৮৬০০০\*৬০\*৬০\*২৪\*৩৬৫\*৪৭=মাইল।বলা বাহুল্য এ হিসাব নূনতম হিসাব। যেহেতু মহা নবী (সাঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) সহ মহা বিশ্বের শেষ সীমা অতিক্রম করেছিলেন, যে মহা বিশ্ব কোটি কোটি গ্যালাক্সী নিয়ে গঠিত।আর একটি গ্যালাক্সী হতেঅন্য গ্যালাক্সীর দূরত্ব গড়ে ত্রিশ লক্ষ আলোক বর্ষ। তাই স্বাভাবিক কারনেই তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের চাইতে বেশী হওয়া প্রয়োজন ছিল।পৃথিবী হতে কোন বস্তুর দূরত্ব যতো বেশী পায়তার ওজন ততই কমে যায়। পৃথিবীর ১(এক) পাউন্ড ওজনের কোন বস্তু ১২০০ শত মাইল উপরে উঠলে তার ওজন হয়ে যায় ১(এক) আউন্স। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, পৃথিবী হতে যে যত উপরে অগ্রসর হবে তার গতি ততো সহজ ও সাবলিল হবে। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব গমনের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর মধ্যাকার্ষনেরশক্তি অকেজু হয়ে যায়। সুতরাং একথা স্বচ্ছভাবে প্রমানিত যে বোরাক ছিল মধ্যাকার্ষন হতে মূক্ত।

বোরাক সমন্ধে যদি আরোও ব্যখ্যা করি তাহলে ‘’বারকুন’’ অর্থ বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ সাধারনত থাকেজোড়ায় জোড়ায়, অর্থাৎ ধনাত্নক (POSITIVE)ঋনান্তক (negative)।.।POSITIVE বা ধণাত্নকবিদ্যুতের নাম হলোআর proton(পুরুষ বিদ্যুৎ)negativeবা ঋনাত্নক বিদ্যুতেনামহলো ELECTRON(স্ত্রী বিদ্যুৎ)।এই দুই মতবাদের বাস্তবতা আমরা অনূভব করি আমাদের চলমান জীবনের কাজের ভিতর দিয়ে। কারণ পজেটিভ ও নিগেটিভ তারের মিলন না ঘটলে বিদ্যুৎ জ্বলেনা। একই ভাবে প্রকৃতির দিকে যদি তাকাই তাহলে অনূরুপ সমাধান চলে আসবে। এখানে মহান সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টির নিগূর রহস্য, যা জ্ঞানী দের জন্য আয়ত্ত করা সহজ, এর বেশী ব্যখ্যা করা দুষনীয়।সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থের মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ বা নূর।অতএব নূর আর নূর বা আলো আলোর গতিতে যে কোন জায়গায় মূহুর্তের মধ্যে চলে যেতে পারে। নবীজি দেখতে সাধারন মানুষের মত হলেও তাঁর দেহ ছিল নূরেরই সমষ্টি,তাঁরপ্রমান এই যে, তাঁর দেহের কোন ছায়া ছিলনা। এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছেঃ- “ক্কাদ জায়াকুম মিনাল্লাহি নূর” অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর হিসাবে” অর্থাৎ তাঁর দেহ আলোকময় ছিল বলেই দেহের কোন ছায়া ছিল না। কারন আলোর কোন ছায়া থাকে না। তা’ছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন যে, “আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী”অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে আমার নূর। তিনি আরোও বলেছেন; “ আনা নূরুল্লাহ ওয়া কুল্লু শাইয়িন মীন নূরী” অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর এবং প্রত্যেক বস্তু আমার নূর থেকে সৃষ্টি। যেহেতু নবীজির দেহ ছিল নূরের তৈরী, সুতরাং নূরের দেহ নিয়ে নূরের বোরাকে আরোহন করে সপ্ত আকাশ ভ্রমন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু না।

মিরাজ সম্পর্কে সন্দেহ বাদীদের আর একটি বড় প্রশ্ন ! একটি রাতের মধ্যে কেমন করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দস হয়ে সাত আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহা পেড়িয়ে মহান আল্লাহর সাথে কথা বার্তা বলে আবার মক্কায় ফিরে এলেন ? যে বিজ্ঞান বলে তারা এটা অবিশ্বাস করে, সেই বিজ্ঞানই বলে সময়ের কোন স্থিরতা নেই, সময় সম্মন্ধে আমাদের ধারনা একেবারেই ভুল। আল্লাহর সময়ের সাথে আমাদের সনয় মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল।আমরা জানি সূর্য্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সময় আবর্তিত, কিন্তু যেখানে সূর্য্য বা অন্য কোন নক্ষত্রের অস্তিত্ব নেই সেখানে সময়ের প্রশ্ন অবাস্তব,প্রকৃতির প্রকৃত সময় আজও আমরা জানিনা ।প্রকৃত পক্ষে সময় বলে কিছু নেই। সকল সময়ই সময় গতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অতিদ্রুত গতিতে ভ্রমন করে তাহলে যে বসে আছে কিংবা স্থীর হয়ে আছে তার গতি প্রথম ব্যক্তির তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই কম হবে।

এখানে আরোও ঊল্লেখ যে অত্যাধিক তাপ,চাপ,ও গতির দরুন পদার্থ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়।ভর শক্তির সমীকরন অনুযায়ী পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে রুপান্তর ঘটানো সম্ভব।পদার্থে একাধারে তাপ, চাপ, গতির যখন প্রসার ঘটে তখন পদার্থ কম শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। এ সবের সময় যে সকল মৌলিক পদার্থের সমন্ময়ে দেহ গঠিত সে সবের অস্তিত পুরোপুরি লোপ পেয়ে তা পরিণত হয় শক্তিতে। পূনরায় যখন আপ,চাপ,গতির স্বাভাবিকতাফিরে আসে তখন কর্ম শক্তি ঘনীভূত হয়ে পদার্থে রুপান্তরিত হয়।হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া সম্ভব।সুরা নূরের ৩৫ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে; “আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ” অর্থাৎ আসমান ও জমীনের নূর। আয়াতের মর্মানুসারে আল্লাহর নূর বা কনিকা ব্যতিত জগতে অন্য কোন পদার্থ নেই।

এখানে মিরাজ একটি সহজ সংঘটিত ব্যাপার, কেননা মিরাজ সংঘটনে যে সমস্ত মাধ্যম ছিল সবই নূরের। তাহলে নূরের আরোহনে নূর নূরের জগতে মিলিত হওয়া অসাধ্য ব্যাপার নয়। মহাবিশ্ব নূরে বিস্তৃত, সুতরাং গতিশীলতায়সময় নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। জগতে মূলতঃ স্থিরকাঠামোবলে কিছু নেই। সব কিছু গতিশীল। স্থান,কাল,জগত সব কিছুই গতির উপর নির্ভরশীল। তবে মহান আল্লাহ অফুরন্ত শক্তি দিয়ে যে কোন সময় যে কোন অঞ্চলে স্থির সময়ের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ কেউ তা করতে পারে না।  মিরাজের শিক্ষা আসমান মানুষের আওতায়, মানুষের স্থান চাঁদ,সূর্য্যের উর্ধে।